224

আজকের কাগজ

তারিখ 22 NOV 1993
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের রাজনীতিকায়ন প্রক্রিয়া

বিনোদ দাশগুপ্ত

পৃথিবীর কোন দেশে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ই রাজনীতিবর্জিত নয়, হতে পারে না। শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের ক্ষেত্রে এ কথা আরও বেশি ভাবে প্রযোজ্য। মানব সমাজে শিক্ষা (প্রথাসিদ্ধ) ব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর থেকেই এর উপর সমাজ নিয়ন্তা শ্রেণী সমূহের কর্তৃত্বও চালু হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন দেশেই কোনদিন সব মানুষ বাস্তবে শিক্ষার সুযোগ পায়নি। অথচ গণতন্ত্রের দাবীদাররা সব সময় শিক্ষাকে মানুষের জন্মগত অধিকার বলেই দাবী করেন।

লক্ষণীয়, যেসব উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে সব মানুষকে সাক্ষর করে তোলা সম্ভব হয়েছে সেসব দেশেও শিক্ষা এবং শিক্ষাঙ্গন রাজনীতিমুক্ত নয়। বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ বা লক্ষ্য অর্জনের পথেই একে পরিচালিত করা হয়। শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন তাই কখনও রাজনীতির দিগন্ত প্রসারিত হাতের নাগালের বাইরে থাকতে পারেনি, পারে না। সব দেশে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণেতারাই শিক্ষানীতি তৈরী ও সংশোধন করেন নিজেদের প্রয়োজনে।

এই উপমহাদেশে আর্যরা এসে যখন এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (গুরু গৃহে) শুরু করেছিলেন সেখানে সমাজের অবহেলিত বা দরিদ্র (শূদ্র) শ্রেণীসমূহের যে প্রবেশাধিকার ছিল না তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারতের গল্পে। কেবলমাত্র রাজপুত্রদের সমরবিদ্যা শিক্ষাদানে নিয়োজিত দ্রোণাচার্যের শিক্ষাঙ্গনে তাই ব্যাধ (শূদ্র), মতান্তরে চণ্ডাল পুত্র একলভ্যকে কখনো জায়গা দেয়া হয়নি। তারচেয়েও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কেবলমাত্র নিজের একক সাধনায় একলভ্য যখন সমরবিদ্যায় অসম্ভব পারদর্শী হয়ে উঠেন তখন দ্রোণাচার্য কৌশলে তাকে পঙ্গু করে দেন। সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদেরকে শিক্ষা লাভ করতে না দেয়ার এরূপ নজীর পাওয়া সম্ভবহয়তো অনেক দেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস থেকেও। অথচ মহাভারতে এটাকে দেখানো হয়েছে পরম গুরুভক্তির নজীর হিসাবে।

ছাত্রসমাজ ও শিক্ষাঙ্গনকে অদৃশ্য বা সূক্ষ্ম রাজনৈতিক নাগপাশে বেঁধে রাখার চেষ্টাও আজকের নতুন ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রেও আর্যরাই এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম শিক্ষা রাজনীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বলা যায়। কারণ তারাই প্রথম বললেন, 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'- অর্থাৎ অধ্যয়ন করাই তাদের একমাত্র তপস্যা। দৃশ্যতঃ নির্দোষ মনে হলেও এ প্রবচনের রাজনৈতিক তাৎপর্য খুব বেশি। এতে বলা হচ্ছে যে, ছাত্ররা শিক্ষায়তন বা গুরু নির্দেশিত ছকে পাঠাভ্যাস করা ছাড়া আর কিছু করবে না, করতে পারবে না।

এতে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার প্রথমতঃ যেসব সমাজ নিয়ন্তা গোষ্ঠী বা শ্রেণী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের রীতি শুরু করেছিলেন তারা নিম্নশ্রেণীর ছাত্ররা যাতে শিক্ষার সুযোগ না পায় সে ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ রাজপরিবারের ছেলেরা ছাড়া আর কেউ যেন রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে মাথা না ঘামান। মূলত ব্রাহ্মণ, পুরোহিত কিংবা বুদ্ধিজীবী (মুনি-ঋষিরাসহ) সম্প্রদায়ের লোকেরা দর্শন ও অন্যান্য জ্ঞানের বিষয়গুলো চর্চা করবে এবং রাজপরিবারের সন্তানরা চর্চা করবে রাজনীতি ও সমরনীতি।

আর্যদের বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্য দিয়েও এই শিক্ষা-দর্শনের কিছু প্রতিফলন ঘটেছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারটি বর্ণ বিভাগের মধ্যে কেবল শ্রেণী এবং কর্মবিভাগই ছিল না। কোন্ বর্ণের লোকেরা কোন্ শিক্ষা কতখানি লাভ করতে পারবে তারও একটা অনুক্ত নির্দেশ ছিল। এই

ব্যবস্থার একটা লক্ষণীয় দিক হলো নিম্নতম শ্রেণীগুলোকে তো শিক্ষার কোন সুযোগই দেয়া হয়নি। মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলো যেন নির্দিষ্ট সীমার বাইরে শিক্ষা লাভের সুযোগ না পায় তারও গৌণ আয়োজন ছিল এর মধ্যে।

অথচ ইতিহাসের গতি কখনও থেমে থাকে না। সভ্যতার আদি যুগের শাসকদের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করেই তাই ইতিহাস এগিয়ে গেছে। বহুকাল আগে থেকেই অবহেলিত নিম্নতম শ্রেণীর সন্তানরাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে এসে বেশ ভীড় জমিয়েছেন এবং এ কারণেই কিনা বলা মুশকিল তবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতিও ঢুকে পড়েছে ব্যাপকভাবে। তবে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ছিল আগে সুপ্ত এখন তা একেবারে মুক্ত। এখানকার রাজনীতি একালে তাই একক কোন গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত নয়।

দেশে বিদ্যমান সব ধরনের রাজনীতিই এখন শিক্ষাঙ্গনে অত্যন্ত সক্রিয়। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল প্রায় সকলেরই ছাত্র সংগঠন রয়েছে বড় বড় শিক্ষাঙ্গনে।

শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি এমন ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়া উচিত কিনা, এতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বা হয়েছে কিনা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিস্তারের জন্য এটা কতখানি দায়ী বা আদৌ দায়ী কিনা এসব প্রশ্নের প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। কিন্তু শিক্ষাকে রাজনীতিকায়নের প্রক্রিয়া যে আজ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেটার সাথে শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতির ব্যাপক বিস্তারের বিষয়টি এক নয়। বৃটিশরা এ দেশ ছাড়ার পর বাংলাদেশ ইতিমধ্যে দু'বার স্বাধীন হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলো সরকারই রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছে। শিক্ষা সম্পর্কে অনেকেই অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন। কিন্তু শিক্ষা বা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বেশিভাবে নিজেদের এবং তাদের আন্তর্জাতিক বন্ধু (প্রভু?)দের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের ছাঁচে ফেলা ছাড়া আর কোন মৌলিক পরিবর্তন কোন সরকারই করেননি।

ফলে শিক্ষা ক্রমেই গণশিক্ষা বিস্তারের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার ২২ বছর পরও বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার পূর্বের চাইতে ৫/৬ শতাংশের বেশি বাড়ানো যায়নি। এখনও জাতীয় সাক্ষরতার হার তাই ২৫/২৬-এ সীমিত। ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সঞ্চার করা ও জিইয়ে রাখার লক্ষ্যে গণশিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থাটিও কোন সরকার গ্রহণ করেনি। সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িক চেতনা বিরোধী গণতান্ত্রিক শিক্ষা চালু করারও

> **গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য চাই অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার অনুকূল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভিত্তিক সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা, এটা না করে এদেশের বিভিন্ন সরকার প্রকৃত পক্ষে গণতন্ত্র বিকাশের একটি প্রধান পথই অবরোধ করে রেখেছেন- যদিও গণতন্ত্রের অন্তসারশূন্য বুলি আওড়াতে কেউই কসুর করছেন না।**

উদ্যোগ নেননি তারা। বরং ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও আরবী ভাষা শিক্ষার বোঝাও কচি শিশুদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। দেশে অনেক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা এক সাথে পাশাপাশি চালু রাখা হয়েছে। পুরোপুরি বিদেশী পদ্ধতির শিক্ষা ছাড়াও দেশীয় পদ্ধতির মাঝেও সম্পূর্ণ ইংরেজী, আধা ইংরেজী, পুরো বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থা তো চলছেই। এর উপর রয়েছে আবার ক্যাডেট পদ্ধতির শিক্ষানামে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও খুব সুবিধাভোগী এক শিক্ষা ব্যবস্থা- যা দেশের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বিভেদ ও শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি করছে। এর বাইরে রয়েছে আবার আরও ভিন্ন প্রকৃতির মাদ্রাসা বা ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা।

এক সাথে এত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার ফলে জনগণের মধ্যে বিরাজিত সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে ওঠা ছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামগ্রিক দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনাবোধ সৃষ্টির পথে খুব বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। এসব ব্যাপার কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। কিন্তু অত্যন্ত সচেতনভাবেই এই অনৈক্য সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে আমাদের ধারণা। এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশলে দেশকে পশ্চাৎপদতা, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অশিক্ষার কবলে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। কারণ বর্তমান ব্যবস্থায় ক্যাডেট স্কুল, কলেজ যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ইংরেজী মাধ্যম এবং একই ধরনের বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলোতে (যা মূলতঃ শহরকেন্দ্রিক) সম্ভবত দেশের এক শতাংশ ছেলেমেয়েরও শিক্ষালাভের সুযোগ নেই। এদিকে সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর থাকা বা না থাকা প্রায় একই। এইগুলোতে (বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে) পড়ালেখা যা হয় তা না হওয়ারই শামিল। যদি কোন ছাত্রছাত্রী আগে-ভাগে লেখাপড়া ছেড়ে না দিয়ে এসব স্কুলের সর্বোচ্চ সীমা পঞ্চম শ্রেণীর দেয়াল কোনরকমে ডিঙিয়েও আসে তবু দু'এক বছর যেতে না যেতেই সে ওখানে যা শিখেছিল তা সবই ভুলে যায়। এই হলো মোটামুটি সরকারী প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার মান। অবশিষ্ট থাকে শুধু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। সেখানে যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্মীয় শিক্ষার উপরই অধিকতর জোর দেয়া হয় তা সকলেরই জানা। তাই এভাবে কার্যতঃ দেশের বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী নিরক্ষরতা বা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

এই পরিস্থিতির পরিপূর্ণ সুযোগ নিতে চাইছে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিসমূহ। নানাবিধ প্রতারণাপূর্ণ বুলি ও তৎপরতার মাধ্যমে তথাকথিত ধর্মীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির নামে আসলে এক ভয়াবহ রাজনীতি শুরু করেছে এরা এবং দেশকে এক গুরুতর সংকটের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এর সাথে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কি সম্পর্ক সেটা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন।

কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায় শিক্ষার তেমন অগ্রগতি হচ্ছে না তা আমরা উপরের আলোচনায় দেখিয়েছি। আবার নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতা যে গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের প্রতিবন্ধক সেটাও নিশ্চয় স্বীকার করবেন সবাই। কাজেই সাংবিধানিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে গণতন্ত্র বিকাশের যে নীতি এখন গ্রহণ করা হয়েছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সেই নীতি বাস্তবায়নের অনুকূল নয়।

এছাড়া নিরক্ষরতা বা অজ্ঞানতা ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারেরও অনুকূল এদিকে আবার সাম্প্রদায়িকতা হলো গণতন্ত্রের এক প্রধান শত্রু। কাজেই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা গণতন্ত্র বিকাশের পথেও এক গুরুতর বাধা। গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য চাই অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার অনুকূল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা, এটা না করে এদেশের বিভিন্ন সরকার প্রকৃত পক্ষে গণতন্ত্র বিকাশের একটি প্রধান পথই অবরোধ করে রেখেছেন- যদিও গণতন্ত্রের অন্তসারশূন্য বুলি আওড়াতে কেউই কসুর করছেন না।

এছাড়া সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে) বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে রেখেও বিভিন্ন সরকার শিক্ষার অগ্রগতিকে ব্যাহত করে চলেছেন। অর্থাৎ যিনি যতই ফাঁকা বুলি আওড়ান না কেন, কেউ আসলে গণতন্ত্রের বিকাশ চাচ্ছে না।

উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনেও (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ) শাসক দল বা শ্রেণীগুলোর (দেশী-বিদেশী) স্বার্থেই পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গন উভয়ই বহু যুগ থেকে শাসক শ্রেণীসমূহের রাজনীতিকায়ন বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এরূপ শৃঙ্খলিত ও আড়ষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষারই যে কেবল কোন অগ্রগতি হতে পারে তা নয়, দেশের উন্নয়নও দারুণভাবে ব্যাহত হতে বাধ্য।

বিনোদ দাশগুপ্ত ঃ প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক।